بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, জগৎ পূজারী কোন ব্যক্তিকে যদি বলা হয় যে, কারো হৃদয়ে যদি সত্যিকার তাক্বওয়া বা খোদাভীতি-খোদাপ্রীতি সৃষ্টি হয় তাহলে সে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল প্রকার নিয়ামত প্রাপ্ত হয়, এর উত্তরে সে অবশ্যই বলবে যে, এগুলো বাজে কথা। ধর্মের নামে মানুষকে নিজের চতুষ্পার্শ্বে সমবেত করার জন্য মানুষ এমন কথা বলেই থাকে। অবশ্য এটিও সত্য কথা যে, আজকাল ধর্মের নামে কেউ কেউ এমন কথা বলেই থাকে আর এর পিছনে তাদের ব্যক্তি স্বার্থও থেকে থাকে। কিন্তু এমন লোকদের নিজেদের মাঝেও তাক্বওয়া বা খোদাভীতি থাকে না আর যারা তাদের অনুসরণ করে তাদের ভিতরও তাক্বওয়া বা খোদাভীতির লেশমাত্র থাকে না।

পক্ষান্তরে আমরা দেখি যে, নবী আর তাঁদের জামাত এবং সত্যিকার শিক্ষার অনুসারীরা তাক্বওয়ার সত্যিকার বুৎপত্তি রাখেন। এই পৃথিবীতে বসবাস করেও, জাগতিক ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও তারা তাক্বওয়ার সন্ধানে থাকে এবং তাক্বওয়ার পথ অনুসরণ করে। আমার কাছে শত শত পত্র আসে যাতে এই কথা লেখা থাকে যে, (দোয়া করুন) আল্লাহ্ তা'লা আমাদের মাঝে এবং আমাদের সন্তান-সন্ততির জীবনে যেন তাক্বওয়া সৃষ্টি করেন। তাদের জীবনে এই যে পরিবর্তন, তা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে গ্রহণ করা এবং বয়আতের অঙ্গীকার রক্ষার সচেতনতার কারণে সৃষ্টি হয়েছে।

এই বাসনা এবং খোদার সাথে সম্পর্ক আর খোদাভীতি বা খোদার ভয় নিঃসন্দেহে তাদেরকে জাগতিক ধন-সম্পদের প্রতি উদাসীন করেছে কিন্তু জাগতিক নিয়ামত থেকে তারা বঞ্চিত হন নি। আল্লাহ্ তা'লা নবীদেরকেও স্বীয় দানে ভূষিত করেন আর তাঁদের সত্যিকার মান্যকারী এবং তাঁদের শিক্ষার অনুসারীদেরকেও জাগতিক নিয়ামতে ভূষিত করে থাকেন। অনেক সময় সাময়িক কষ্ট এবং অ-সাচ্ছন্দ্য দেখা দিয়ে থাকে কিন্তু পুনরায় খোদার কৃপাবারি বর্ষিত হয় এবং অবস্থায় পরিবর্তন আসে। অনুরূপভাবে মুত্তাকীরা সল্পে তুষ্ট থেকে অভ্যস্ত আর এই বৈশিষ্ট্যের কারণে তারা সামান্য অসচ্ছলতাকে সানন্দে মাথা পেতে নেন আর খোদার কৃপার ফলে যে নিয়ামতই লাভ হয় তার জন্য তারা তাঁর দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। যার ফলে খোদা তা'লার স্বল্প দানেও মুত্তাকীদের মাঝে কৃতজ্ঞতার অভ্যাস সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতার অভ্যাসে অভ্যস্ত যারা তাদের ওপর তিনি বর্ধিত কৃপাবারি বর্ষণ করেন। আর এই সমস্ত কৃপারাজি প্রত্যক্ষ করে একজন প্রকৃত মু'মিন পুনরায় ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয়ে যায় এবং কুরবানী দিয়ে থাকে। আজকের এই যুগে এ বিষয়ের সত্যিকার Understanding বা বুৎপত্তি আমরা আহমদীরাই রাখি যাদের সামনে রয়েছে

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর যুগ আর একই সাথে তাঁর নিবেদিত প্রাণ দাসের যুগ ও তাঁদের আদর্শ। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে এক জায়গায় বলেন,

দেখ! রসূল করীম (সা.)-এর হাত থেকে মানুষ সব কিছু ছিনিয়ে নিয়েছে। একইভাবে সাহাবা (রা.)-এর কাছ থেকেও মানুষ সব কিছু ছিনিয়ে নিয়েছে। কিন্তু খোদা তা'লার মোকাবেলায় কোন কিছুকেই তারা গুরুত্ব দেন নি আর এর ফলে অবশেষে খোদা তা'লা তাঁদেরকে সবকিছু দিয়েছেন বা সকল দানে ধন্য করেছেন। অনুরূপভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) খোদার খাতিরে সব কিছু বিসর্জন দিয়েছেন। যদিও তাঁর বংশের অর্ধেক সম্পত্তির তিনি মালিক ছিলেন কিন্তু তাঁর ভাবী যাকে আল্লাহ্ তা'লা পরবর্তীতে আহমদীত গ্রহণের সৌভাগ্য দিয়েছেন, তিনি তাঁকে অকর্মণ্য মনে করতেন। অনেক অসচ্ছলতা ও কষ্ট ছিল কিন্তু (পরবর্তীতে) খোদা তা'লা তাঁকে সব কিছু দিয়েছেন। এই অবস্থার চিত্র হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর এক পঙক্তিতে এভাবে অংকন করেছেন যে,

লুফাযাতুল মাওয়ায়িদে কানা উকুলী ফা সিরতুল ইয়াওমা মিতাআমাল আহালী

অর্থাৎ "এমন এক সময় ছিল যখন আমি ছিলাম মানুষের উচ্ছিষ্টভোগী আর আজ আমার দস্তরখান থেকে হাজারো মানুষের জীবিকা নির্বাহ হচ্ছে।"

আমাদের অর্থাৎ আহমদীদের ঈমান আজ এই কারণে অবশ্যই দৃঢ়তা লাভ করে যখন আমরা তাঁর প্রারম্ভিক যুগ এবং পরের যুগের তুলনা করি। এই অবস্থার চিত্র সমধিক স্পষ্ট করতে গিয়ে এক জায়গায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যখন জন্ম হয় তখন তাঁর পিতা-মাতা হয়তো তাঁর জন্মে আনন্দ প্রকাশ করে থাকবেন কিন্তু তিনি যখন বড় হন এবং তাঁর মাঝে জগৎ বিমূখতা সৃষ্টি হয় তখন তাঁর পিতা তাঁর এই অবস্থা দেখে আক্ষেপ করতেন যে, আমাদের ছেলে কোন কাজের নয়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি ঘটনা শুনিয়েছেন যার কথা আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, এক শিখ তাকে (রা.) বলেছেন, আমরা দুই ভাই ছিলাম। আমরা হযরত মির্যা সাহেবের কাছে যেতাম অর্থাৎ হযরত মির্যা গোলাম মুর্তজা সাহেবের কাছে। একবার তিনি আমাদের পিতাকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে বলেন, আপনি তার কাছে যাওয়া-আসা করেন তাই তাকে একটু বুঝান। তিনি যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে যান, তিনি বলেন যে, আমি মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের কাছে গিয়ে তাঁকে বললাম যে, আপনার পিতা এই কথা ভেবে খুবই দুঃখ ভারাক্রান্ত হন যে, তার ছোট পুত্র বড় ভাইয়ের দেয়া খাবার খেয়েই লালিত পালিত হবে। সে কোন কাজ করে না। তাকে বল আমার জীবদ্দশায় কোন চাকুরি করতে। আমি চেষ্টা করছি সে যেন কোন ভালো চাকুরি পায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পিতা বলেন, আমি মারা গেলে আয় উপার্জনের সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে যাবে। সেই শিখ বলেন, আমরা যখন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের কাছে গেলাম আর তাঁর সামনে তাঁর পিতার

চিন্তা-ভাবনার বহিঃপ্রকাশ করলাম এবং বললাম যে, আপনার অবস্থা দেখে তাঁর খুব দুঃখ হয় আর তিনি অর্থাৎ হযরত মির্যা গোলাম মুর্তজা সাহেব বলেন, আমি যদি মৃত্যুবরণ করি তাহলে গোলাম আহমদের কী হবে? তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বললেন, আপনি আপনার পিতার কথা কেন শিরোধার্য করেন না?

তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পিতা কপুরথলায় বা কপুরথলা স্টেটে তাঁর (আ.) জন্য কোন কাজের চেষ্টা করছিলেন আর স্টেট তখন তাঁকে স্টেটের শিক্ষা কর্মকর্তা নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয় আর এর অফার বা প্রস্তাবও এসে যায়। সেই শিখ বলেন, আমরা যখন এ কথা বললাম যে, আপনি নিজের পিতার কথা কেন শিরোধার্য করেন না, তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) উত্তর দেন যে, আমার পিতা অনর্থক চিন্তা করেন। আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি কেন চিন্তিত হন। আমার যার চাকুরি গ্রহণ করা ছিল করে রেখেছি। তিনি বলেন, এরপর আমরা ফিরে আসলাম আর মির্যা গোলাম মুর্তজা সাহেবকে সব কথা বললাম। তখন মির্যা সাহেব বলেন যে, সে যদি এ কথা বলে থাকে তাহলে ঠিক আছে কেননা সে মিথ্যা বলে না। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনের সূচনা ছিল আর তখনও তিনি পরম মার্গে পৌঁছেন নি কিন্তু সাময়িক যেই পরাকাষ্ঠা দেখা যায় তা হলো, তাঁর মৃত্যুর সময় সহস্র সহস্র মানুষ তাঁর জন্য সর্বস্ব উজাড় করতে প্রস্তুত ছিল। আমি যে পঙক্তির কথা বলেছি, যা পূর্বেই পাঠ করেছি যে,

লুফাযাতুল মাওয়ায়িদে কানা উকুলী ফা সিরতুল ইয়াওমা মিতাআমাল আহালী

অর্থাৎ "এমন এক সময় ছিল যখন আমি ছিলাম মানুষের উচ্ছিষ্টভোগী আর আজ আমার দস্তরখান থেকে হাজারো মানুষের জীবিকা নির্বাহ হচ্ছে।"

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, তাঁর সূচনা কত তুচ্ছ ছিল কিন্তু তাঁর সমাপ্তি এমন হয়েছে যে, যারা লঙ্গরখানায় খিদমত করতো বা কাজ করতো তারা ব্যতিরেকে দৈনিক দুই থেকে আড়াই শত মানুষ খাবার খেতো। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনিও তাঁর ভাইয়ের মত তাদের অর্ধেক সম্পত্তির অংশীদার ছিলেন কিন্তু জমিদারদের সাধারণ রীতি হলো, যে বেশি কাজ করতো সে সম্পত্তির প্রকৃত অংশীদার গন্য হতো, আর যে কাজ করতো না তাকে সম্পত্তির অংশীদার হিসেবে গন্য করা হতো না; আর এই রীতি সেই যুগে আরো ব্যাপক ছিল। মানুষ সচরাচর বলে বসে, যে কাজ করে না, সে সম্পত্তির অংশ কিভাবে পেতে পারে? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনের প্রথম দিকে তাঁর কাছে যখন কোন সাক্ষাৎ প্রত্যাশী আসতো তখন নিজ ভাবীর কাছে খাবার চেয়ে পাঠালে তিনি বলে বসতেন, অনর্থক বসে বসে খাচ্ছে, কাজ-কর্ম কিছুই তো করে না। এর পর সেই খাবার তিনি অতিথিদেরকে খাইয়ে দিতেন আর নিজে অনাহারে কাটাতেন বা সামান্য ছোলা খেয়ে দিনাতিপাত করতেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, আল্লাহ্ তা'লার কুদরত দেখুন, যেই ভাবী তখন তাঁকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখতেন সেই ভাবীই পরে আমার হাতে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। এক

কথায় আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যখন কোন কাজের সূচনা করা হয় তখন এর সূচনা খুব একটা চোখে পড়ে না কিন্তু এর পরিসমাপ্তি দেখে জগৎ হতভম্ব হয়। আজও আমরা দেখি, শুধু কাদিয়ান নয় বরং কাদিয়ানের বাইরে পৃথিবীর অনেক দেশে তাঁর অতিথিশালা বা লঙ্গরখানা কাজ করছে। তখন হয়তো দু'তিনটি তন্দুরে খাবার প্রস্তুত হতো বা লঙ্গর চলছিল কিন্তু আজ আমরা দেখি, কাদিয়ানে, রাবওয়ায় আর এখানে অর্থাৎ লন্ডনেও তাঁর অতিথিশালায় রুটির প্লান্ট লাগানো আছে, আর এক বেলায় লক্ষ লক্ষ রুটি প্রস্তুত করা হচ্ছে। এখানে জলসার যে ব্যবস্থাপনা রয়েছে তাতে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে লঙ্গর বা আতিথেয়তার ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত ব্যাপক। এবার আল্লাহ্ তা'লার ফযলে যেভাবে পূর্বেই বলেছি যে, অনেক সাংবাদিকও এসেছিলেন, পত্র-পত্রিকার সাংবাদিকেরা এসেছেন। তারা আমাদের লঙ্গরখানার ব্যবস্থাপনা ও খাবার রান্না হতে দেখে আর রুটির প্লান্ট দেখে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। মেশিনের রুটি সবারই পছন্দ হয়। এক সাংবাদিক যখন দাঁড়িয়ে দেখছিলেন তখন তিনি খাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। তখন তাকে রুটি দেয়া হয়। তিনি তা খেয়েছেন এবং তার খুব পছন্দ হয়। তিনি সম্পূর্ণ খেয়ে ফেলেন এবং জিজ্ঞেস করেন, আর খেতে পারি কি? আহমদী যিনি সাথে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে খান এবং যত ইচ্ছা খেতে পারেন কেননা এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর লঙ্গরখানা বা অতিথিশালা, এখানে খাবারের কোন ঘাটতি নেই।

এক যুগ এমন ছিল যখন একজন মেহমান আসলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজের খাবার তাকে দিয়ে দিতেন এবং নিজে অনাহার যাপন করতেন আর কোথায় দেখুন আজকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সহস্র সহস্র মানুষ তাঁর দস্তরখানে বা অতিথিশালায় খাবার খাচ্ছে। আর এখানেই এর শেষ নয়। এইসব লঙ্গর খানা বা অতিথিশালা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করবে, ইনশাআল্লাহ্। লক্ষ লক্ষ মানুষ বরং কোটি কোটি মানুষ তাঁর লঙ্গরখানা বা দস্তরখানে বা অতিথিশালায় খাবার খাবে। আর এভাবে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষ তাঁকে মানার পর তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি করবে।

আজ জাগতিক আয় উপার্জনকারী আহমদীদের মাঝে কুরবানীর বা ত্যাগের যে মান চোখে পড়ে সেটিও সব কিছু নয়, এই কুরবানীর মানও ইনশাআল্লাহ্ উন্নত হতে থাকবে। সুতরাং কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি যদি শুধু লঙ্গরখানার ব্যবস্থাপনাকেই গভীর দৃষ্টিতে দেখে আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রাথমিক অবস্থা এবং যুগকে যদি সামনে রাখে তাহলে এটিই তাঁর সত্যতার অনেক বড় একটি নিদর্শন আর এটি অবশ্যই আমাদের ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয়। এছাড়া আমরা যখন দেখি যে, পুরো ব্যবস্থাপনা চালানোর জন্য জামাতের মাঝে আর্থিক কুরবানীর যে প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছে তাও সেই তাক্বওয়ারই ফলাফল যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পৃক্ততার ফলে আমাদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলের মাঝে প্রকৃত তাক্বওয়া সৃষ্টির প্রতি সচেতনতা সৃষ্টি করুন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র জীবনের বিভিন্ন দিক এবং কিছু ঘটনার ওপর আলোকপাত করে থাকেন। তিনি যেভাবে বর্ণনা করেন এবং যে উপসংহার টানেন বা ফলাফল বের করেন সেটিও তাঁরই এক বিশেষত্ব। একজন সাধারণ মানুষ কোন ঘটনার বাহ্যিক অবস্থাকে হয়তো উপভোগ করতে পারে বা উপভোগ করাই সার কিন্তু হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তা থেকে বড় সূক্ষ্ম কথা বের করেন আর তাও আমাদের ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয় এবং আমাদেরকে তত্ত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর খাওয়ার রীতি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,

মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর খাওয়ার রীতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। আমি অন্য কাউকে সেভাবে খেতে দেখি নি। তিনি (আ.) রুটি থেকে বা চাপাতি থেকে ছোট একটি টুকরো পৃথক করতেন। এরপর সেটিকে গ্রাসে পরিণত করার পূর্বে সেটিকে আঙ্গুল দ্বারা টুকরো টুকরো করতেন আর সুবহানাল্লাহ্ সুবহানাল্লাহ্ বলতেন এরপর সেগুলো থেকে একটি ছোট টুকরো নিয়ে তরকারিতে স্পর্শ করে মুখে নিতেন। তিনি (আ.) এতে এতটা অভ্যস্ত ছিলেন যে, যারা দেখতো তারা আশ্চর্য্য হতো আর অনেকেই ভাবতো যে, তিনি রুটির ভিতর হালাল টুকরো সন্ধান করছেন। সত্যিকার অর্থে এর পিছনে যে প্রেরণা কাজ করতো তা হলো, আমরা খাবার খাচ্ছি অথচ খোদার ধর্ম সমস্যায় কবলিত। প্রতিটি গ্রাস তাঁর গলায় আটকে যেত আর সুবহানাল্লাহ্ সুবহানাল্লাহ্ বলে তিনি যেন খোদার দরবারে ক্ষমা চাইতেন যে, তুমিই এই খাদ্য পানীয়ের মুখাপেক্ষিতা সৃষ্টি করেছ অর্থাৎ খাবার খাওয়া বা খোরাকের মানুষ মুখাপেক্ষী; নতুবা ধর্মের সমস্যার সময় এই খাবার কোনভাবেই আমাদের জন্য বৈধ ছিল না। মনে হতো যে, সেই খাবারও এক ধরণের সংগ্রাম বা এক ধরনের যুদ্ধ তার কাছে যুদ্ধ মনে হতো। ইসলাম এবং ধর্মের সমর্থনে তাঁর হৃদয়ে যে সূক্ষ্ম আবেগঅনুভূতি বিরাজ করতো এই যুদ্ধ হতো তার এবং সেই সব চাহিদার মাঝে যা প্রাকৃতিক বিধান পূর্ণ করার জন্য খোদা তা'লা সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ ধর্মের সমর্থনে তাঁর হৃদয়ে যে আবেগ অনুভূতি বিরাজ করতো তার মাঝে এবং খাওয়া, তৃষ্ণা নিবারণ করা ইত্যাদি মানবিক চাহিদার মাঝে এক ধরণের যুদ্ধ চলতো। তাঁর খাবার খাওয়াও একটি বাধ্য বাধকতা ছিল কিন্তু তাঁর আসল চিন্তা ছিল ধর্মের সমর্থন এবং ইসলামের উন্নতির।

সুতরাং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই আদর্শ এই দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে যে, আমরা যখন খোদার নিয়ামতরাজি ব্যবহার করি প্রথমত তাঁর দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত, তাঁর তসবীহ্ করা উচিত আর একই সাথে ধর্মের বিরাজমান অবস্থা দেখে ব্যথিত হওয়া উচিত এবং এই চেষ্টা করা উচিত যে, কিভাবে ধর্ম প্রচার ও প্রসারে আমরা ভুমিকা রাখতে পারি। খাবার খাওয়ার যে রীতি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছিল তার মাধ্যমে তসবীহ্র বিষয়টি আরও পরিষ্কার করতে গিয়ে কুরআনের আয়াত " يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي

السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ" অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু খোদার তসবীহ্-তে রত এই আয়াত থেকে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই গূঢ় কথা বের করেছেন।

তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন খাবার খেতেন, পূর্বেও এই কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, বড় কষ্টে তিনি একটি টুকরো খেতেন। যখন তিনি খাবার খেয়ে উঠতেন তখন রুটির অনেক ছোট ছোট টুকরো তাঁর সামনে দেখা যেত কেননা যেভাবে বলেছি যে, তাঁর অভ্যাস ছিল রুটি টুকরো টুকরো করা। কোন টুকরো নিয়ে তিনি মুখে রাখতেন আর বাকী টুকরো দস্তরখানেই পড়ে থাকত। তিনি (রা.) বলেন, জানা নেই যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কেন এমনটি করতেন কিন্তু অনেকেই বলতেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এটিই সন্ধান করতেন যে, রুটির টুকরোগুলোর মাঝে কোনটি তসবীহ্ করেছে আর কোনটি করে নি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মুখে এমন কথা শুনেছি বলে এখন আমার মনে নেই কিন্তু এই কথা আমার মনে আছে যে, মানুষ এমনই বলতো। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, " يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ" অর্থাৎ আকাশ সমূহ এবং পৃথিবী থেকে তসবীহ্র ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে। এখন আল্লাহ্ তা'লা কেন বলছেন যে, আকাশ এবং পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু আল্লাহ্ তা'লার তসবীহ্ করছে অথচ সেই তসবীহ্র ধ্বনি শুনা আমাদের জন্য সম্ভব নয়। আমাদের জন্য যা শুনা সম্ভব নয় তা আমাদেরকে বলারও কোন প্রয়োজন ছিল না অর্থাৎ আমরা যা শুনতে পারি না তার আমরা কি বুঝবো। তাই খোদার এটি বলার উদ্দেশ্য কী? কুরআনের কোথাও কি এটি লিখা আছে যে, জান্নাতে অমুক ব্যক্তি যেমন আব্দুর রশীদ নামের ব্যক্তি দশ হাজার বছর ধরে বসে আছে? এটি উল্লেখ করলে যেহেতু আমাদের কোন লাভ হওয়ার ছিল না তাই আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এমন কথা বলেননি।

তাই প্রশ্ন হলো আল্লাহ্ তা'লা যে বলছেন, "يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ" অর্থাৎ আকাশ সমূহ এবং পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু খোদার তসবীহ্ করছে এর অর্থ এটিই হতে পারে যে, হে মানব মন্ডলি! এই তসবীহ্ বা খোদার এই পবিত্রতার গান শোন। আমরা যখন বলি, চন্দ্র উদিত হয়েছে, এর অর্থ হলো মানুষের এসে সেই চন্দ্র দেখা উচিত। অথবা আমরা যখন বলি যে, অমুক ব্যক্তি গান গাইছে এর অর্থ হবে, চল তার গান শোন। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লা যখন বলেন যে, "يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ" অর্থাৎ আকাশ এবং পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু খোদার পবিত্রতা ঘোষণা করছে এর অর্থ হলো তোমরা এই পবিত্রতার গান শোন। তাই বুঝা গেল যে, এই তসবীহ্ এমন যা শোনাও সম্ভব। একটি শোনা হলো নিম্ন মানের আরেকটি হলো উচ্চ মানের। কিন্তু উচ্চ মানের শ্রবণ তাদের জন্যই সম্ভব যাদের অনুরূপ কান এবং চোখ থাকে। একারণেই মু'মিনদেরকে যখন বলা হয় যে, যখন খাবার শুরু করা হয় তখন তার বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলা উচিত, খাবার শেষ করে আলহামদুলিল্লাহ্ বলা উচিত, কাপড়

পরিধান করলে বা অন্য কোন দৃশ্য দেখলে অবস্থা বা পরিস্থিতি অনুসারে তসবীহ্ করা উচিত। অতএব এক কথায় মু'মিনের তসবীহ্ বলতে যা বুঝায় তা হলো এই সমস্ত বস্তু নিচয়ের জন্য তসবীহ্ বা পবিত্রতার গান গাওয়ার সত্যায়ন করা অর্থাৎ কাপড়ের তসবীহ্, খাবারের তসবীহ্ এবং অন্য সব জিনিসের তসবীহ্র সে সত্যায়ন করে।

মানুষ খাবার খাওয়ার সময় যখন বিসমিল্লাহ্ বলে, খাওয়া শেষ করে আলহামদুলিল্লাহ্ বলে, কাপড় পরিধান করার সময় দোয়া করে, আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ করে। এসব কাজ যা মানুষ নিজে করছে আসলে এর মাধ্যমে সেই সমস্ত বস্তু নিচয়ের পক্ষ থেকে তসবীহ্ হয়ে থাকে। সেগুলো দেখে মানুষ যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এটি সেসব বস্তুর পক্ষ থেকে তসবীহ্ বলে গন্য হয়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, কতজন আছে যারা এটি মেনে চলছে। তারা দিবারাত্র পানাহার করে, পাহাড় অতিক্রম করে, নদী দেখে, সবুজের মেলা প্রত্যক্ষ করে, গাছপালা এবং ক্ষেত হিল্লোলিত হতে দেখে বা পাখিদের কলতান শুনে কিন্তু তাদের হৃদয়ে এর কি প্রভাব পড়ে? তাদের হৃদয়েও এর মোকাবেলায় তসবীহ্র প্রেরণা সৃষ্টি হয় কি? যদি না হয় তাহলে তারা এসব জিনিসের তসবীহ্ শুনে নি। তোমরা বলবে যে, আমাদের কানে তসবীহ্র কোন ধ্বনি আসে না। আমি বলছি, অনেক ধ্বনি কান হতে নয় বরং ভিতর থেকে অর্থাৎ হৃদয় থেকে উত্থিত হয়। তাই প্রতিটি কৃতজ্ঞতা যা মানুষ কোন কিছুর জন্য প্রকাশ করে বা আল্লাহ্ তা'লার কোন কুদরতকে দেখে যখন সে সুবহানাল্লাহ্ বলে তখন মানুষের এই তসবীহ্ করা বা খোদার পবিত্রতার গান গাওয়া আসলে সেসব বস্তু নিচয়েরই তসবীহ্ কিন্তু তা নিঃসৃত হয় মানুষের মুখ থেকে, এই বিষয়টি বুঝতে হবে। তসবীহ্র এই রীতিও আমাদের অবলম্বনের চেষ্টা করা উচিত বরং সত্যিকার তাক্বওয়া হলো এমন তসবীহ্ করাকে আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক অভ্যাসে পরিণত করা।

এই যুগে আল্লাহ্ তা'লা ইসলামের ওপর আক্রমণকারীদের মুখ বন্ধ করার জন্য এবং ইসলামের সৌন্দর্য্য প্রকাশের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন। এই প্রেক্ষাপটে একটি ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন। এক খ্রীস্টান আসে এবং সে বলে যে, আপনি তো বলেন কুরআনের ভাষা বা language হলো সব ভাষার জননী অথচ ম্যাক্সমুলার প্রমুখ লিখেছেন যে, উম্মুল আলসেনাহ্ (সব ভাষার জননী) সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। এরপর মানুষ ধীরে ধীরে তার বিস্তার করে বা বিস্তৃত করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমরা ম্যাক্সমুলারের এই সূত্র মানি না যে, উম্মুল আলসেনাহ্ (সব ভাষার জননী সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। যাহোক বিতর্ক সংক্ষিপ্ত করার জন্য আমরা এই সূত্রকে স্বীকার করি, এখন চলুন আরবী ভাষাকে দেখি যে, তা এই মাপকাঠিতে পাশ করে কিনা? সেই ব্যক্তি এটিও বলেছিল যে, ইংরেজী ভাষা আরবীর মোকাবেলায় অতি উন্নত মানের।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ইংরেজী জানতেন না কিন্তু তিনি বলেন যে, ঠিক আছে, আপনিই বলুন, 'আমার পানি' বাক্যের ইংরেজীতে অনুবাদ কী হবে। সে বলে, My water। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আরবীতে তো এটিকে কেবল "মাঈ" বলা হয়। "মাঈ" বললেই এই অর্থ প্রকাশ পায়। এখন আপনি বলুন যে, My water বেশি সংক্ষিপ্ত না "মাঈ" বেশি সংক্ষিপ্ত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যদিও ইংরেজী জানতেন না কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মুখ থেকে এমন শব্দ নিঃসৃত করেন যে, আপত্তিকারী নিজেই ফেঁসে যায়। সে খুবই লজ্জিত এবং নির্বাক হয়ে যায় আর বলে, তাহলে তো আরবীই সংক্ষিপ্ততম ভাষা হলো। এটিই পবিত্র কুরআনের বাস্তব চিত্র।

আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাঁকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করবেন অর্থাৎ সবসময় এমন সব মানুষ সামনে আনতে থাকবেন যারা কুরআন পাঠ করবে, কুরআনের প্রতি সত্যিকার ভালোবাসা রাখবে এবং এর তফসীরকারী হবে। তাঁরা শত্রুদেরকে তাদের আক্রমনের এমন উত্তর দিবে যে, তাদের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত তিনি কুরআনে এমন বৈশিষ্ট্য রেখেছেন যে, আপত্তিকারী যে আপত্তিই করুক না কেন তার উত্তর এতেই অন্তর্নিহিত রয়েছে।

মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, স্যার সৈয়্যদ আহমদ খাঁন তার স্বীয় যুগে খ্রীস্টানদের বিভিন্ন আপত্তির খণ্ডন করেছেন। এরপর আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দাঁড় করিয়েছেন যিনি এত দীর্ঘকাল শত্রুর মোকাবেলা করেছেন যে, তাঁর ইন্তেকালে শত্রুরাও এই কথা স্বীকার করেছে যে, তিনি ইসলামের সুরক্ষা এত অসাধারণ ভাবে করেছেন যে, তাঁর পূর্বে অন্য কোন মুসলমান আলেম এভাবে ইসলামের সুরক্ষার কাজ করে নি। এটি **"ওয়াল্লাহু ইয়াসেমুকা মিনান্ নাস"**-এরই কারিশমা ছিল। হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে খোদার প্রতিশ্রুতি ছিল যে, তিনি তাকে (সা.) অবশ্যই রক্ষা করবেন। শত্রুরা যখন তরবারীর মাধ্যমে আক্রমন হানে তখন তিনি তাদের তরবারীকে ভোঁতা করে দেন। শত্রুর তরবারী ভেঙ্গে গেছে। আর তারা যখন ইতিহাসের মাধ্যমে হামলা করে তখন আল্লাহ্ তা'লা এমন মুসলমানদের দাঁড় করিয়েছেন যারা ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীর অনুসন্ধান করে শত্রুর আপত্তির খণ্ডন করেছেন আর স্বয়ং বিরোধীদের প্রবীনদের ইতিহাস খুলে বলেছেন যে, তারা ইসলামের ওপর যে আপত্তি করছে তা তাদের নিজেদের ধর্মের বিরুদ্ধেই বর্তায়। আর আপত্তির যে অংশ কুরআন এবং হাদীসের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল তা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বয়ং পরিষ্কার করেছেন।

সুতরাং আজও যারা ইসলামের বিরুদ্ধে আপত্তি করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ধর্মীয় সাহিত্য বা রচনাবলীর মাধ্যমে আমরা তাদের মুখ বন্ধ করতে পারি। তাই এদিকে আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত।

আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় ধর্মের সমর্থনে স্বয়ং নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করে থাকেন আর যুক্তি প্রমাণও জানিয়ে থাকেন বা অবহিত করেন। যারা জ্ঞানগত রুচি রাখে তাদের বক্ষ তিনি

উন্মোচিত করেন। কিন্তু অনেকেই এমনও হয়ে থাকে যারা জ্ঞানের স্বল্পতা সত্ত্বেও আলেম সাজার আতিশয্যে অপ্রয়োজনীয় কথা বলে বসে যার ফলে অনেক সময় সমস্যা দেখা দেয় বরং বিরোধীরা হাসি ঠাট্টার সুযোগ পায়। এমনই একটি ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মানুষ ধর্মের মাঝে নতুন নতুন বিষয়াদির অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে আর তারা এটিও বুঝে উঠতে পারে না যে, এটি কত লজ্জাস্কর বিষয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে বাটালা নিবাসী এক বন্ধু ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি আহমদীয়াতও গ্রহণ করেছেন। তিনি খুবই নিষ্ঠাবান আহমদী ছিলেন। যেভাবে পূর্বেই বলা হয়েছে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছিলেন যে, আরবী ভাষা হলো সব ভাষার জননী। সব ভাষা এটি থেকে উৎসারিত হয়েছে। তখন বাটালা নিবাসী এই আহমদী এই বিষয়টিকে নিয়েই কাজে ঝাপিয়ে পড়েন। কিন্তু যেহেতু তার জ্ঞান বেশী ছিল না, আরবীর খুব একটা বোধ-বুদ্ধি ছিল না। তিনি এচেষ্টায় আত্মনিয়োজিত করেন যে, আমরা প্রমাণ করব, সব শব্দ আরাবী ভাষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ভাষা জানতেন ও ব্যাকরণ জানতেন এবং ভাষা সম্পর্কে অবগত ও অবহিত ছিলেন তাই তিনি যে বিষয়েরই অবতারণা করতেন তা জ্ঞানের ভিত্তিতেই করতেন। সবকিছু কুরআনে বিদ্যমান মর্মে তিনি একথা বুঝান নি যে, কুরআনে কামারের কাজ কিভাবে করা যেতে পারে বা কৃষিকাজের নীতি কি তা-ও লিখা আছে। সব কিছু কুরআনে বিদ্যমান এর অর্থ হলো সমস্ত ধর্মীয় প্রয়োজনীয় বিষয়াদী কুরআনে বিদ্যমান। কিন্তু সেই ব্যক্তি ধরে নিয়েছেন যে, কুরআনে সব কিছু আছে। এটি নিয়ে যখন তিনি অনেক বেশী হইচই আরম্ভ করেন এবং সব জায়গায় সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে এটি বলা আরম্ভ করেন যে, সবকিছু কুরআনে আছে তখন মস্তিষ্ক বিকৃত এক ব্যক্তি বলে যে, কুরআনে আলু এবং মরিচের কথা কোথাও নেই। আর এই ব্যক্তিরও কোন উত্তর দেয়ার ছিল। তিনি তখন বলেন যে, اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ -এর অর্থ হলো আলু এবং মরিচ। কিন্তু আসলে এর অর্থ হলো, পদ্মরাগমণি এবং প্রবাল। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, এক দিকে অন্ধকারের আধিক্য দেখুন যে, অনেকের মতে ফুকাহা বা ফকীহ্দের কথাও আল্লাহ্র কথার মত, যা পরিবর্তন হয় না। তারা ফুকাহা বা জ্ঞানী লোকদের কথাকেই প্রাধান্য দেয়। তারা বলে যে, সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। কোন ফকীহ্ বা জ্ঞানী ব্যক্তি যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন সেটিই চুড়ান্ত কথা, সেটিকে পরিবর্তন করা যেতে পারে না। অপরদিকে মানুষ বিভিন্ন পরিবর্তন পরিবর্ধন করতে গিয়ে সীমা ছাড়িয়ে যায়।

এটি থেকে আমার একটি কথা মনে পড়ল যে, ১৯৭৪-এর দাঙ্গার সময় একবার ফয়সালাবাদে এক মৌলভী সাহেব বক্তৃতা করছিলেন আর قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ -এর ব্যাখ্যা করছিলেন যে, কুরআনে قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ লিখা আছে। এর অর্থ হলো আহমদীরা কাফির। তিনি সূরা ইখলাসের এই আয়াতের এই ব্যাখ্যাই করেছেন। যাহোক হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, এমন মানুষ উভয় ক্ষেত্রেই বাড়াবাড়ি করে, কোন নীতি বা নিয়ম-কানুন নেই অথচ আসল

রীতি হল মধ্যম পন্থী হওয়া। পরিবর্তন-পরিবর্ধন গ্রহণের জন্য মানুষকে প্রস্তুত থাকা উচিত কিন্তু পরিবর্তন আনয়ন করা খোদার হাতে। তিনি যখন চান পরিবর্তন আনেন আর তিনি যখন পরিবর্তন আনতে চান পৃথিবী সেই পরিবর্তনকে কখনো বাধাগ্রস্থ করতে পারে না।

এছাড়া কিছু মানুষের ভ্রান্ত চিন্তাধারা সম্পর্কেও হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেছেন। তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে এক ব্যক্তি কাদিয়ানে আসে এবং বলে যে, মির্যা সাহেবকে ইবরাহীম, নূহ , মূসা, ঈসা এবং মুহাম্মদ (সা.) আখ্যা দেয়া হলে আমাকেও আল্লাহ্ তা'লা সবসময় বলেন যে, তুমি মুহাম্মদ। এতে মানুষ যখন তাকে বুঝানো আরম্ভ করে তখন সে বলে যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আওয়াজ আসে, তিনি নিজেই আমাকে বলেন যে, তুমি মুহাম্মদ। অতএব তোমাদের যুক্তি প্রমাণ আমার ওপর কিইবা প্রভাব ফেলতে পারে? তাই এর কোন প্রভাব পড়েনি। মানুষ যখন বোঝাতে বোঝাতে ক্লান্ত হয়ে যায় তখন তারা ভাবলেন যে, একে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সামনে উপস্থাপন করলেই ভালো হবে। তারা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর কাছে অনুরোধ করেন যে, আপনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে অনুরোধ করে সময় নিন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে বিষয় উপস্থাপন করেন। তিনি (আ.) বলেন যে, ঠিক আছে, তাকে ডাক। তখন সেই ব্যক্তিকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সকাশে আনা হয়। সে বলে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সবসময় বলছেন যে, তুমি মুহাম্মদ। তিনি (আ.) উত্তর দেন যে, আমাকে তো আল্লাহ্ তা'লা সবসময় এটি বলেন না যে, তুমি ইবরাহীম, তুমি মূসা, তুমি ঈসা। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যখন আমাকে বলেন যে, তুমি ঈসা তখন ঈসার বৈশিষ্ট্য আমার মাঝে সৃষ্টি করেন। যখন তিনি বলেন যে, তুমি মূসা তখন মূসা সংক্রান্ত নিদর্শনাবলী আমার জন্য প্রকাশ করে থাকেন। আর আপনাকে যদি সবসময় আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, আপনি মুহাম্মদ তাহলে প্রশ্ন হলো তিনি কি আপনাকে পবিত্র কুরআনের তত্ত্ব, জ্ঞান এবং সূক্ষ্ম নিগূঢ় রহস্যও শিখান? তখন সেই ব্যক্তি বলে যে, এমন কিছুই দেন না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর এটিই পার্থক্য। যদি সত্যিকার অর্থে কেউ কাউকে অতিথি রাখে তাহলে সে তাকে খাদ্যও দেয়। কিন্তু কেউ যদি কারো সাথে ঠাট্টা করে তাহলে তাকে ডেকে তার সামনে হাসি ঠাট্টার ছলে খালি বর্তন বা প্লেট রেখে দেয় আর বলে যে, এটি পোলাও, এটি জর্দা। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা হাসি ঠাট্টা করেন না। শয়তান হাসি ঠাট্টা করে। যদি আপনাকে মুহাম্মদ বলা হয় আর কুরআনের তত্ত্ব, তথ্য এবং নিগূঢ় রহস্য শিখানো না হয় তাহলে এমন কথা যে বলে সে খোদা নয় বরং শয়তান। আল্লাহ্ তা'লা কিছু বললে সে অনুসারে বস্তুও মানুষের সামনে উপস্থাপন করেন। যদি আপনার সামনে কিছু উপস্থাপন করা না হয় তাহলে আপনি নিশ্চিত হতে পারেন যে, আপনাকে যে মুহাম্মদ বলছে সে খোদা নয় বরং শয়তান। আর সত্য কথা হলো পরিবর্তন আল্লাহ্ তা'লাই সৃষ্টি করেন।

সুতরাং এমন মানুষ যারা অনেক সময় কিছু স্বপ্নের কারণে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে বড় বড় দাবি করা আরম্ভ করে দেয় তারা সত্যিকার অর্থে শয়তানের প্রভাবাধীন থাকে। আল্লাহ্ তা'লা যখন কাউকে কিছু দেন তখন সেই দানের ঔজ্জল্যও প্রকাশ করেন, স্বীয় সমর্থন ব্যক্ত করেন, নিদার্শনাবলী প্রকাশ প্রায়। আল্লাহ তা'লার ব্যবহারিক সাক্ষ্য তার অনুকূলে কাজ করে। এ অবস্থাই আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনে দেখেছি। তাঁর (আ.) মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী আমরা দ্বিতীয় খলীফার ক্ষেত্রে পূর্ণ হতে দেখেছি। আর আহমদীয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত যে শুভ সংবাদ তিনি দিয়েছিলেন, খোদার ব্যবহারিক সাক্ষ্যের কল্যাণে আমরা তা পূর্ণতা লাভ করতে দেখেছি। আল্লাহ্ তা'লা সকল আহমদীর ঈমান এবং বিশ্বাসকে দৃঢ় করুন। তারা যেন এই কথা গুলো বুঝে উঠতে পারে।

নামাযের পর আমি একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব যা মোকাররমা সাহেবযাদী আমাতুল বারী সাহেবার। ২০১৫ সনের ৩১শে আগস্ট এবং ১লা সেপ্টেম্বরের মধ্যবর্তী রাতে ৮৭ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون। শ্রদ্ধেয়া আমাতুল বারী সাহেবা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পৌত্রি, হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেবের কন্যা, হযরত নবাব মোহাম্মদ আলী খান সাহেবের দৌহিত্রী ছিলেন এবং সৈয়্যদা আমাতুল হাফীয বেগম সাহেবা নবাব আব্দুল্লাহ্ খাঁন সাহেবের পুত্রবধূ ছিলেন। তার স্বামী ছিলেন জনাব আব্বাস আহমদ খাঁন সাহেব মরহুম এছাড়া তিনি আমার ফুফুও ছিলেন। ১৯২৮ সনের ১৭ই অক্টোবরে কাদীয়ানে তার জন্ম হয়। ১৯৪৪ সনের ২৯ ডিসেম্বর মিঞাঁ আব্বাস আহমদ খাঁন সাহেবের সাথে যখন তার নিকাহ্ হয় তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) জুমুআর খুতবা আরম্ভ করার পূর্বে কয়েকটি নিকাহ্র ঘোষণা দেন। তিনি (রা.) বলেন, কয়েকটি নিকাহ্ পড়াতে চাই আর আমি এ কথা বেশ কয়েকবার বলেছি যে, কিছুকাল আমি কেবল এমন মানুষের নিকাহ্ পরাতে পারবো যারা হয় আমার আত্মীয় হবে বা তাদের সাথে আমার সম্পর্ক আত্মীয়ের মত হবে বা যেমন- ধর্মের জন্য যারা জীবন উৎসর্গ করে থাকবে তারা এর অন্তর্গত। এছাড়া অন্য কারও নিকাহ্ তখন পরাতে পারবো যখন এমন প্রিয়জনদের নিকাহ্ পরানোর সময় দরখাস্ত বা অনুরোধ করা হবে। যাহোক তিনি (রা.) বলেন, আজকে আমি স্নেহের আব্বাস আহমদ খাঁন সাহেবের নিকাহ্ পড়াতে চাই যে আমার ছোট বোন এবং মিঞাঁ আব্দুল্লাহ্ খাঁন সাহেবের পুত্র আর মেয়ে বা কনে হলেন মিঞাঁ শরীফ আহমদ সাহেবের কন্যা। এক কথায় ছেলে আমার ভাগিনা আর মেয়ে আমার ভাতীজি।

এরপর তিনি বিভিন্ন নসীহত করেন আর জীবন উৎসর্গ করার কথা বলেন এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহ.)-এর নাম উল্লেখ করেন। তখন খানদানের ছেলেদের মধ্য থেকে তিনি ওয়াকফ্ করেছিলেন এবং এদিকে অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষন করেন। এরপর তিনি বলেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আজ থেকে ৬০, ৭০ বছর পূর্বে এই ইলহাম ছাপিয়েছিলেন যে, **'তারা নাসলান বায়ীদা'** আর আমরা খোদা তা'লার বিশেষ কৃপায় এই ইলহামকে এমন ভাবে পূর্ণ হতে দেখছি যে, প্রতিদিন প্রতিনিয়ত সেই নিদর্শনের গুরুত্ব এবং মাহাত্ম্য ক্রমবর্ধমান । অনেক

নিদর্শন এমন হয়ে থাকে যে, যখন তা ছাপা হয় তখন অনেক বড় মানের নিদর্শন হয়ে থাকে এবং এর মাহাত্ম্যও বেশি হয়ে থাকে কিন্তু যতই সময় অতিবাহিত হতে থাকে সেই নিদর্শনের মাহাত্ম্য ক্রমশ হ্রাস পায়। আর কিছু নিদর্শন এমন হয়ে থাকে যা প্রথম দিকে ছোট মানের হয়ে থাকে কিন্তু কালের প্রবাহে তা বড় হয়ে যায়। কালের প্রবাহে এর মাহাত্ম্য বৃদ্ধি পেতে থাকে।

যেমন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি যখন **'তারা নাসলান বায়ীদা'** এলহাম হয় তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শুধু দুই পুত্র ছিলেন। এরপর আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপায় তাঁর ঘরে আরো কিছু ছেলে মেয়ের জন্ম হয়। আর এরপর আল্লাহ্ তা'লা তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। এখন সেই সব ছেলে মেয়েদের প্রজন্ম এই ইলহাম অনুযায়ী বিয়ে করছে এবং **'তারা নাসলান বায়ীদা'** -র সত্যায়ন হচ্ছে। তিনি বলেন, পৃথিবীতে নব প্রজন্ম তো সামনে এসেই থাকে তাই এক আপত্তিকারী হয়তো বলতে পারে যে, এটি কিভাবে নিদর্শন হতে পারে, কেননা অধিকাংশ মানুষেরই তো প্রজন্ম বৃদ্ধি পেয়ে থাকে কিন্তু প্রশ্ন হলো কজন মানুষের এমন প্রজন্ম আছে যারা তাদের প্রতি আরোপিত হয় এবং আরোপিত হতে গিয়ে গর্ব বোধ করে। অধিকাংশ মানুষের আওলাদ বা প্রজন্ম এমন হয়ে থাকে যে, তাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, তোমার বড় দাদার নাম কি? তারা জানে না। কিন্তু **'তারা নাসলান বায়ীদা'** এই ইলহাম বলছে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রজন্ম তাঁর প্রতি আরোপিত হতে থাকবে এবং মানুষ ইশারা করে বলবে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বংশ তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে তাঁর সত্যতার নিদর্শন।

সুতরাং **'তারা নাসলান বায়ীদা'** -তে শুধু এই ভবিষ্যদ্বাণীই করা হয়নি যে, তাঁর বংশ অগণিত হবে বরং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অসাধারণ মহিমার কথাও এই ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর মর্যাদা এত মহান এবং এত উন্নত যে, তাঁর বংশ এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর প্রতি আরোপিত না হওয়া সহ্য করবে না আর তাঁর প্রতি আরোপিত হওয়ার মাঝেই তাদের মহিমা এবং তাদের মাহাত্ম্য নিহিত। সুতরাং এই ভবিষ্যদ্বাণীতে কেবল এ কথাই অন্তর্নিহিত নয় যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বংশ অগণিত হবে বরং এটিও উল্লেখ রয়েছে যে, সেই বংশ প্রতিদিন প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তারা যত বড় মর্যাদার অধিকারীই হোন না কেন এমনকি রাজত্ব হস্তগত হলেও তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি আরোপিত হয়ে গর্ববোধ করবে। সুতরাং **'তারা নাসলান বায়ীদা'**-এর অর্থ হলো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, তোমার বংশ কখনও তোমাকে চোখের আড়াল করবে না আর তোমার বংশ কখনও নিজের দাদাকে ভুলার চেষ্টা করবে না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই ইলহামের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, দুঃখের এক দিন আর চারটি বিয়ে। এর অর্থ হলো তাঁর বংশের কেউ কেউ মারাও যাবে যেভাবে আল্লাহ্ তা'লার রীতি রয়েছে কিন্তু তাঁর বংশ বা প্রজন্ম কমবে না বরং সংখ্যা বাড়তে থাকবে। একজন

মারা গেলে চার জন জন্ম গ্রহণ করবে। যেখানে একজন মারা যায় আর চারজনের জন্ম হয় সেখানে অবধারিত ভাবে সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বংশ চিরকাল তাঁর মাহাত্ম্য এবং তাঁর মর্যাদার উচ্চতার নিদর্শন হিসেবে বিরাজ করবে। তারা চিরকাল তাঁর প্রতি আরোপিত হয়ে গর্ববোধ করবে। যখন তাঁর প্রতি আরোপিত হয়ে তারা গর্ববোধ করবে এর অর্থ হবে অন্য ভাষায় তাঁর সন্তান সন্ততি নিজেদের দাদার মাহাত্ম্য এবং সম্মানকে স্বীকার করবে আর পৃথিবী এই স্বীকারোক্তির মাহাত্ম্য এবং গুরুত্ব শিরোধার্য করবে।

আমি যে বিশদভাবে এটি উল্লেখ করলাম এর কারণ হলো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বংশের লোকদের ওপর এর ফলে অনেক বড় দায়িত্ব অর্পিত হয়। এই দায়িত্বকে বুঝুন আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই উক্তিও সব সময় সামনে রাখুন যে, আমাদের প্রতি আরোপিত হয়ে বা আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আমাদেরকে বদনাম করো না। সুতরাং শুধু বংশ হওয়াই মাহাত্ম্যের কারণ নয় বরং তাঁর শিক্ষা মেনে চলা এবং তাঁর প্রতি আরোপিত হয়ে, তাঁর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তাঁর সম্মান, মাহাত্ম্য এবং মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করা সবার জন্য আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লা এই বংশকে এবং এই খানদানকে এই তৌফিক দিন।

দেশ বিভাগের সময় যখন পাকিস্তান গঠিত হয় তখন মরহুমা সেই বাসে সফরের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন যাতে হযরত আম্মাজান এবং খানদানের আরো কিছু মহিলা সফর করছিলেন আর লাহোর পৌঁছে প্রাথমিক দিনগুলোতে তিনি রতনবাগে অবস্থান করেন যেখানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) অবস্থান করেছিলেন। এর পরেও তিনি সবসময় লাহোরেই ছিলেন। তার একটি বড় বিশেষত্ব হলো দরিদ্রের লালন ও আতিথেয়তা। তিনি অকৃত্রিম স্বভাবের অধিকারিণী ছিলেন। প্রায় সময় তাঁর ঘর অতিথিতে ভরা থাকত। যেই ধরণের মেহমানই আসুক না কেন আত্মীয় হোক বা কোন বন্ধু হোক বা অনাত্মীয় কোন দরিদ্র হোক না কেন সর্বোত্তমভাবে আতিথ্য করতেন। এটি তার অনেক বড় একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, খুবই সম্মানজনক ব্যবহার করতেন তিনি। অনুরূপভাবে তার পরিচিতির গণ্ডি অনেক ব্যপক ছিল।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর খানদান ছাড়াও মানুষের সাথে তার ব্যাপক পরিচিতি ছিল। জামাতের যার সাথেই পরিচয় হয়েছে সে তার ভক্তদের গণ্ডিভুক্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে মালির কোটলার অ-আহমদী আত্মীয় স্বজনের সাথেও তিনি সব সময় সুসম্পর্ক বজায় রেখেছেন বা বজায় রাখতেন। কিছু অতিথি তো সাময়িক হয়ে থাকে কিন্তু স্থায়ী অতিথিও যেমন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বংশের সদস্যরা, যুবক-যুবতি, ছেলে-মেয়েরা যখন লাহোরে কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তো আর এছাড়াও আমি দেখেছি যে, অন্যরাও তার ঘরে থাকত এবং তাদেরকেও তিনি সানন্দে আতিথেয়তা করেতেন। আতিথেয়তার কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। যখনই কেউ পৌঁছাত তাৎক্ষনিকভাবে আতিথেয়তার দায়িত্ব পালনে ব্রতী হতেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর জীবনের অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা তাঁর জানা ছিল যা তিনি আত্মীয় স্বজনকে শুনাতেন আর এইগুলো সংরক্ষিত রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাকে সাচ্ছন্দ্য দিয়েছিলেন। তিনি সেই সাচ্ছন্দ্য সবসময় দরিদ্রদের সেবার কাজে লাগিয়েছেন। অনেকের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার ব্যয়ভার তিনি নির্বাহ করেছেন আর বিয়ে-শাদি উপলক্ষ্যে খোলা হাতে সাহায্য করতেন। অনুরূপভাবে তার স্বামী মিঞাঁ আব্বাস আহমদ খাঁন সাহেবের ইন্তেকালের পর নাযারাত তা'লীমের মাধ্যমে তার নামে স্থায়ী বৃত্তি জারি করেন। তিনি পড়ে গিয়েছিলেন তাই কিছু দিন থেকে তার পায়ে ফ্র্যাকচার ছিল, দু'তিনটি অপারেশনও হয়েছে। এর জন্য তার বড় কষ্ট ছিল কিন্তু পরম ধৈর্য্যের সাথে হাসি মুখে তা সহ্য করেছেন। ৩১শে আগস্ট এবং ১লা সেপ্টেম্বরের মধ্যবর্তী রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون।

চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রে বড় উন্নত মানের চাঁদা দাতা ছিলেন। হিস্যায়ে আমদ, হিস্যায়ে জায়েদাদ, ওসীয়্যত ইত্যাদি নিজ জীবদ্দশায় আদায় করে গেছেন। ১৯৫৮ থেকে ৯২ বা ৯৪ পর্যন্ত লাহোর জেলার লাজনা সংগঠনে বিভিন্ন পদে কাজ করেছেন, সেক্রেটারী ছিলেন এবং সেবা করেছেন। এক যুগে লাহোর লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবেও কাজ করেছেন। আমি যেভাবে বলেছি, গরীবদের প্রতি সহানুভূতিশীল, তাদের দেখাশুনাকারী, তাদের সুখ দুঃখের অংশীদার, আমি তাকে আপন পর সবার কাজে যেভাবে আপন জনের মত অংশ নিতে দেখেছি অন্য কাউকে সেভাবে অংশ নিতে দেখিনি। কেউ যদি কোনভাবে তার সেবা করে থাকে তাহলে তাকে তার প্রতিদান দিতেন। মুনির হাফেযাবাদী সাহেব বলেন যে, ১৯৮৯ সনের জুবিলী জলসায় যখন কাদিয়ানে মুনির হাফেযাবাদী সাহেব কিছুটা সেবার তৌফিক পেয়েছেন তখন তিনি তাকেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পাগড়ির একটি টুকরা তবারক হিসেবে দিয়েছেন।

অনুরূপভাবে এবার বন্ধুরা দেখে থাকবেন যে, আন্তর্জাতিক বয়আতের সময় আমি ভিন্ন রঙের একটা কোট পরেছিলাম যা সবুজ ছিল না, কিছুটা ভিন্ন রঙের ছিল। এই কোট তিনিই আমাকে পাঠিয়েছিলেন। এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কোট ছিল যা হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেবের কাছে ছিল। এরপর উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর কাছে আসে আর তিনি আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, আমি এটি তোমাকে দিচ্ছি। খিলাফতের সাথে তাঁর পরম উন্নত মানের সম্পর্ক ছিল, শ্রদ্ধা এবং সম্মানের সম্পর্ক ছিল। আমাকে সব সময় ফোন করতেন, কথা বলার গভীর ইচ্ছা ব্যক্ত করতেন। সব সময় তাঁর এই চিন্তা ছিল যে, আমার সন্তানদের আল্লাহ্ তা'লা পুণ্যের তৌফিক দিন। তারা যেন সব সময় একতাবদ্ধভাবে জীবন যাপন করে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর আওলাদ বা সন্তানদের তাঁর পুণ্যকে ধরে রাখার তৌফিক দিন এবং তারা যেন ঐক্যের বন্ধনে জীবন যাপন করতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মর্যাদা উন্নীত করুন, মাগফিরাত করুন। আমি যেভাবে বলেছি, নামাযের পর আমি তাঁর গায়েবানা জানাযা পড়াব।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।